সারংক্ষেপ (Abstract)

বাংলা উপন্যাস সাহিত্য এমন একটি শিল্প যা বিশ শতকের প্রথমার্ধে এক কঠিন সময়ে আলোড়িত জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। মানুষের চিন্তাশক্তি বাইরের জগতের সাথে সাথে তাকিয়েছে বিচিত্র মনোজগতের দিকে। ১৯১৪ সালে *সবুজপত্র* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের মুক্তচিন্তা ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীর চলার পথে আর একজনকে দেখা গেল, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ওড়িষার দেশীয়রাজ্য ঢেঙ্কানালে তাঁর জন্ম। পিতা নিমাইচরণ, মাতা হেমনলিনী। ওড়িয়া সংস্কৃতি ও পরিবারের বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা। পবরর্তীকালে পড়াশোনা সূত্রে পাটনা, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ, প্রশিক্ষণ সূত্রে ইউরোপের মাটিতে পদার্পণ এবং কর্মসূত্রে বঙ্গদেশ তাঁর জীবন পরিক্রমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, গান্ধীজি, লিও টলস্টয়-এর ভাবধারার পাশাপাশি *সবুজপত্র* এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। প্রবন্ধ, ছড়া, ছোটোগল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখক হিসেবে পারদর্শীতার পরিচয় দিলেও অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ উপন্যাস সাহিত্য। তাঁর উপন্যাসগুলিতে এক গভীর অন্তর্দর্শন, মনন ও চিন্তাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ১৯২৭-এ আই.সি.এস. প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপ যাত্রার ভ্রমণাভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) গ্রন্থটি, যার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের আসরে জায়গা করে নেন। তারপর একে একে সৃষ্টি করেন ভিন্নধর্মী সাহিত্য, একে একে রচনা করে চলেন এক একটি মূল্যবান উপন্যাস। সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে মানবজীবন কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা তিনি স্বজ্ঞা ও মনন দিয়ে বিচার করেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ককে বার বার মেলাতে চেয়েছেন। চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তিধর্মীতাকে, বিচক্ষণতা ও বিচারশীলতাকে, নৈতিকতা ও মানবিকতাকে প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতায়, শৈলীতে ও শিল্পীত্বে উপন্যাস রচনায় অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল— *অসমাপিকা* (১৯৩১), *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৩০), *সত্যাসত্য, ছয় খণ্ড* (১৯৩২-১৯৪২), *পুতুল নিয়ে খেলা* (১৯৩৩), *না* (১৯৫১), *কন্যা* (১৯৫৩), *সুখ* (১৯৬১), *বিশল্যকরণী* (১৯৬৭), *তৃষ্ণার জল* (১৯৬৯), *পাহাড়ী* (১৯৪৪), *রাজঅতিথি* (১৯৭৮), *রত্ন ও শ্রীমতি, তিন ভাগ* (১৯৫৭-১৯৭২), *ক্রান্তদর্শী, চারপর্ব* (১৯৮২-১৯৮৬)।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচিত উপন্যাসগুলি নিয়ে কেন আমাদের এই গবেষণা এ প্রশ্ন অনায়াসেই উঠে আসে। তাঁর উপন্যাসের এমন কিছু দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যা আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে গতিদান ও সমৃদ্ধ করেছে। উপন্যাসে মননশীল ভাবনা ও বৃহত্তর জীবনচেতনাকে শিল্পরূপ দেওয়ার অনবদ্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্তর্দর্শনের আলোকে শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান জীবনশিল্পী অন্নদাশঙ্করের ছিল অন্যতম কাজ। ইতিপূর্বে তাঁর সাহিত্য নিয়ে তেমন কোনো গবেষণার কাজ হয়নি। বিশেষত তাঁর উপন্যাস নিয়ে কোনো গবেষণাকর্ম হয়েছে সেরকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তবে বেশ কিছু গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নির্দিষ্ট কিছু দিক নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক আলোকপাত করেছেন। তবে সেখানে উপান্যাস সম্পর্কে আলোচনাই অতিসামান্য। তাঁর বৃহৎ উপন্যাস ভাণ্ডারকে একটু ছুঁয়ে গেছেন মাত্র। কোথাও আবার ছোঁয়ারও চেষ্টা করা হয়নি। আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের সাথে সাহিত্যিক জীবন, বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যের সাথে কীভাবে জড়িয়ে আছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই গবেষণাকর্মে যে দিকগুলি দেখানো হয়েছে, তা পূর্বে কোনো গবেষক বা লেখক দেখাননি বলে আমার ধারণা। গবেষণাকর্মটিতে দেখানো হয়েছে বিশ শতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে যে আলোড়ন ও তারই ঘাতপ্রতিঘাত। বিশ শতকের প্রথমার্ধে জটিল আবহে সত্য ও অহিংসার সাথে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার। নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মানুষের নব নব চেতনার জাগরণ। নারী শুধু পুরুষের ধ্বনির প্রতিধ্বনি নয়। নারীরও আছে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। নারীর শাশ্বত রূপ ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধান, সংস্কৃতির মিলনে কেন তিনি বিশ্বাসী। লেখক এক গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কীভাবে হতে চেয়েছিলেন আধুনিক ও আধ্যাত্মিক, রসপিপাসু ও সত্যসন্ধ্যানী, বর্তমানের ভাষ্যকার ও ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা। কাহিনির গতিময়তা ও চরিত্রের মুখে কীভাবে ভাষা দিয়ে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছালেন। তিনি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে কীভাবে হয়ে উঠলেন মননশীল বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকের সাথে সাথে হৃদয়জীবী। এমন অনেক বিষয়ই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এইসব নতুন দিক অন্বেষণই এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ছয়টি অধ্যায়ে। তারপরে আছে উপসংহার।

প্রথম অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় অধ্যায়- অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : রাজনীতি ও ইতিহাস প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়- অন্নদাশঙ্কর রায়ে উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও সংস্কৃতি

চতুর্থ অধ্যায়- অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : শাশ্বত সত্যের অন্বেষণ

পঞ্চম অধ্যায়- অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : তত্ত্ব ও দর্শন প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ অধ্যায়- অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : আঙ্গিক ও শৈলী প্রসঙ্গ

উপসংহার -

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নানাভাবে অর্জিত ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কীভাবে তাঁর জীবনবোধকে গড়ে তোলার সাথে সাথে ঠিক কীভাবে ঔপন্যাসিক সত্তাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল। সেই সঙ্গে উপন্যাস সম্পর্কে নিজস্ব ধারণার ভিত্তিতে সত্য, প্রেম ও সৃষ্টির আনন্দবেদনায় কীভাবে একের পর এক উপন্যাস সৃষ্টি করলেন, তারই কথা এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে মানবজীবনের সঙ্গে রাজনীতি ও ইতিহাসের কেমন করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশ শতকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেমন করে রাজনীতি মানুষের জীবনেতিহাসের গতিপথ তৈরি করে দেয়। লেখক দেশপ্রেমী ও দক্ষপ্রশাসক হিসেবে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে কেমন করে একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের অবদান রেখেছেন— এই অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের সংস্কৃতি চিন্তা নিয়ে। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কীভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে এক বৃহত্তর জীবনচেতনায় যুগোপযোগী উদার মানবিক সংস্কৃতি ও সমন্বয়ের কথা বললেন তাঁর উপন্যাসে— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বিশ শতকে দুই মহাযুদ্ধ ও তার পরিস্থিতির প্রবাহে স্বার্থপরতা, বিশ্বাসহীনতা ও মূল্যবোধের অবসানের যুগে কীভাবে মানুষের অন্তর্জগৎ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। কীভাবে মানবপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে স্বীয় অন্তর্জগতে শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান করেছেন— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বুদ্ধিজীবী মননশীল সাহিত্যিক হিসেবে কতকগুলি তত্ত্ব ও দর্শনের ভিত্তিতে অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসগুলিকে কীভাবে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনন, চিন্তন, বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা থেকে যে গভীর অন্তর্দর্শন গড়ে ওঠে এবং তার থেকে উদ্ভূত কতকগুলি তত্ত্বও বা কীভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মানুষের সামগ্রিক

জীবনকে জানতে লেখক যে কতকগুলি তত্ত্ব ও দর্শনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সেগুলি উপন্যাসে কোথায় কীভাবে ছড়িয়ে আছে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটা মূল্যবান— সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে শৈলী ব্যবহারের নিজস্বতা কীভাবে একজন সাহিত্যিকের শৈল্পিক সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। এক গভীর দর্শন, মনন ও বৃহত্তর জীবনচেতনায় সমৃদ্ধ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলীর বিশিষ্টতা। লেখক তাঁর উপন্যাসে দেশকালের বিস্তৃত পরিসরে কীভাবে বৃহত্তর জীবনসত্যকে ভাবপ্রধান বক্তব্যে উপস্থাপন করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীর গদ্যশৈলী ব্যবহার করেছেন। কীভাবে দেশ-কালের প্রেক্ষিতে সত্যানুসন্ধানের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখদের ভাষা বা শৈলী থেকে তাঁর উপন্যাসে কীভাবে সহজ সরল ভাষায় গুরুগম্ভীর বক্তব্য উপস্থাপনের প্রকাশভঙ্গি দেখালেন— সেই দিকটিও এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাতে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কিছু সূত্র আমাদের সামনে তুলে আনার চেষ্টা করেছি। ছয়টি অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসগুলির কতকগুলি বিশেষ দিক গবেষণামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তিনি যে একজন বুদ্ধিজীবী মননশীল সাহিত্যিকের সাথে সাথে মানবপ্রেমিক ও হৃদয়জীবী তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে আজীবন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ইলুমিনেশন, প্রেম ও সৃষ্টির আনন্দ বেদনা। দেশ-কালের প্রেক্ষিতে প্রেম সৌন্দর্য শাশ্বত নারী বিশেষত সত্যের অনুসন্ধান কীভাবে উপন্যাস সাহিত্যে মিশে দেশকালাতীত চিরন্ততার দাবি রাখে, তারই নানা দিক এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি ভাবুক জীবনশিল্পী, শতাব্দীর অতন্দ্রপ্রহরী এবং ক্রান্তদর্শী হিসেবে কেন পরিচিত তার কার্যকারণ সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হয়েছে।